

একাদশ অধ্যায় জীবের প্রজনন

প্রজনন (Reproduction) জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীব তার জীবদশায় নিজের প্রতিনিধ সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবভেদে প্রজননের সার্বিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এ অধ্যায়ে মানব প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- জীবের প্রজননের ধারণা ও পুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন অঙ্গ হিসেবে ফুলের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্রের সাহায্যে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণীর অযৌন ও যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজননের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বহিঃ ও অন্তঃনিষেকের পার্থক্য করতে পারব।
- রক্ত চিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন কার্যক্রমে হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানব ব্রূণের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে এইডস এর সংক্রমণের কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর এইডস এর ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস প্রতিরোধে গোস্টার/ লিফলেট অঙ্কন করে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- এইডস রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

জীবে প্রজননের ধারণা ও গুরুত্ব

জীবের জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। শুধুমাত্র জীবের মৃত্যু হলে পৃথিবী থেকে একসময় জীবের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, কারণ একদিকে পৃথিবীতে যেমন জীবের মৃত্যু ঘটছে অন্যদিক তেমনি প্রজননের মাধ্যমে জীবের জন্ম হচ্ছে। প্রজনন হচ্ছে এমন একটি শারীরতত্ত্বীয় কার্যক্রম যার মাধ্যমে জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ বংশধর রেখে যায়। যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব তার বংশধর সৃষ্টি করে তাকেই প্রজনন বলে।

প্রজনন প্রধানত দুই প্রকার, যথা- অযৌন ও যৌন। সাধারণত নিম্নশ্রেণির জীবে যৌন প্রজনন হয় না, তবে কোনো কোনো নিম্নশ্রেণির জীব যৌন উপায়েও প্রজনন ঘটায়। উচ্চ শ্রেণির অধিকাংশ উদ্ভিদ ও উচ্চ শ্রেণির সকল প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশধর সৃষ্টি করে। যৌন জননে দুটি বিপরীতধর্মী জননকোষ পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটিকে পুং জননকোষ ও অন্যটিকে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু (Egg) বলা হয়। এ দুধরনের জননকোষ একই ফুলে বা একই দেহে সৃষ্টি হতে পারে। উন্নত উদ্ভিদে এ দুধরনের জননকোষ একই দেহে সৃষ্টি হয়। এরা সহবাসী উদ্ভিদ। যখন দুধরনের জননকোষ আলাদা দেহে সৃষ্টি হয় তখন সেই উদ্ভিদকে ভিন্নবাসী উদ্ভিদ বলে।

জননকোষ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত এই যে, জনন মাতৃকোষকে অবশ্যই মিয়োসিস (Meiosis) পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে হয়। ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা জনন মাতৃকোষের অর্ধেক হয়ে যায়। অবশ্য পুং ও স্ত্রী জননকোষদ্বয় মিলিত হয়ে যে জাইগোট সৃষ্টি করে তাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা পুনরায় জনন মাতৃকোষের সমান হয়ে যায়। পরে এই জাইগোটটি মাইটোটিক কোষ বিভাজনের (Mitotic cell division) মাধ্যমে বারবার বিভাজিত হয়ে একটি নতুন জীবদেহ সৃষ্টি করবে। এ ভাবে একটি জীব বহু জীবের জন্ম দিয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় জীব তার ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টি করে বংশধার রক্ষা করে।

প্রজনন না হলে জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যেত। একটি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া হতে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল জীব এভাবে বংশধর সৃষ্টি করে প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে কি উপায়ে প্রজনন ঘটবে তা জীবের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এ জন্যই নিম্নশ্রেণির জীব যেখানে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জনন ঘটায় সেখানে উচ্চ পর্যায়ের জীব জটিল প্রক্রিয়ায় যৌন জনন সংঘটিত হয়।

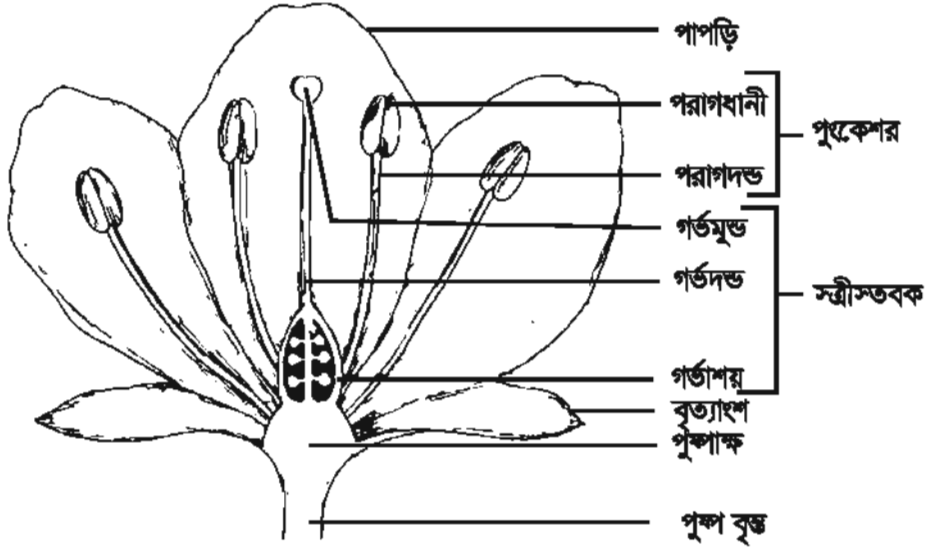
উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ-ফুল

প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপই (Shoot) ফুল। ফুল উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ। আমরা জানি যে একটি আদর্শ ফুলের পাঁচটি অংশের মধ্যে দুটি অংশ (পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক) প্রজননের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। এরা সরাসরি প্রজননে অংশ নেয়। কিন্তু অন্য অংশগুলো সরাসরি অংশ গ্রহণ না করলেও প্রজননে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। যে ফুলে পাঁচটি অংশ উপস্থিত থাকে তাকে সম্পূর্ণ ফুল বলে। এর যেকোনো একটি অংশ না থাকলে সে ফুলকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। বৃত্তযুক্ত ফুলকে সবৃত্তক এবং বৃত্তহীন ফুলকে অবৃত্তক ফুল বলে। যখন কোনো ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই উপস্থিত থাকে সেটি উভলিঙ্গ ফুল (Bisexual flower), পুংস্তবক বা স্ত্রীস্তবকের যেকোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে একলিঙ্গ ফুল (Unisexual flower) ও দুটোই অনুপস্থিত থাকলে ক্লীব ফুল (Neuter flower) বলে।

ফুলের বিভিন্ন অংশ

পুষ্পাঙ্ক (Thallamus) : সাধারণত এটি গোলাকার এবং ফুলের বৃত্তশীর্ষে অবস্থান করে। পুষ্পাঙ্কের উপর বাকি চারটি স্তবক পরপর সাজানো থাকে। পুষ্পাঙ্ক ফুলকে আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরে।

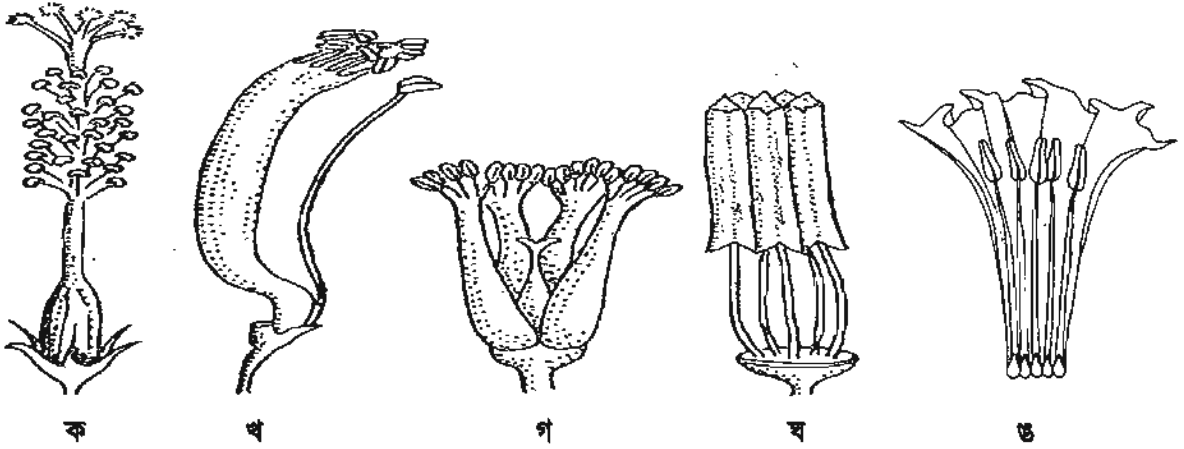
বৃত্তি (Calyx) : ফুলের বাহিরের স্তবককে বৃত্তি বলে। বৃত্তি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্তবৃত্তি, কিন্তু যখন এটি খণ্ডিত হয় তখন তাকে বিযুক্তবৃত্তি বলে। এর প্রতিটি খণ্ডকে বৃত্ত্যাংশ বলে। সবুজ বৃত্তি খাদ্য প্রস্তুত কাজে অংশ নেয়। এদের প্রধান কাজ ফুলের ভিতরের অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি ও পোকাকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তবে যখন বৃত্তি রঙ বেরঙের হয় তখন তারা পরাগায়নে সাহায্য করে অর্থাৎ পরাগায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এমন পোকামাকড়, পশু, পাখি ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে।



চিত্র-১১.১ একটি ফুলের বিভিন্ন অংশ (লম্বচ্ছেদ)।

দলমণ্ডল (Corolla) : এটি বাহিরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক। এরা খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ডকে দল্যাংশ বা পাপড়ি বলে। পাপড়িগুলি যুক্ত থাকলে যুক্তদল এবং আলাদা থাকলে বিযুক্তদল বলা হয়। এরা সাধারণত রঙিন হয়। এরা ফুলের অত্যাৱশ্যকীয় অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। উজ্জ্বল বালমলে রঙের দলমণ্ডল পোকামাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়নে সাহায্য করে। অনেক সময় কোনো কোনো পোকামাকড় ফুলের পাপড়িতে বসে মধু খেতে সাহায্য করে। এসব কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে পরাগায়নের কাজটি হতে থাকে।

পুংস্তবক (Androecium) : এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং একটি অত্যাৱশ্যকীয় অংশ। এই স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বলে। একটি পুংস্তবকে এক বা একাধিক পুংকেশর থাকতে পারে। পুংকেশরের দণ্ডের মতো অংশকে পুংদণ্ড এবং শীর্ষের ধলের মতো অংশকে পরাগধানী বা পরাগরেণু ধরা বলে। পরাগধানী ও পুংদণ্ড সহযোগকারী অংশকে যোজনী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগ উৎপন্ন হয়। এই পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয়ে পোলেন টিউব গঠন করে। এই পোলেন টিউবে পুংজনন কোষ (Malegamete) উৎপন্ন হয়। পুংজননকোষ সরাসরি জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে। কখনও পুংস্তবকের পুংদণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আবার পরাগধলিগুলোও কখনও পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। পরাগদণ্ড এক গুচ্ছে থাকলে তাকে একগুচ্ছ (Monadelphous), যেমন— জবা; দুইগুচ্ছে থাকলে দ্বিগুচ্ছ (Diadelphous), যেমন— মটর এবং বহুগুচ্ছে থাকলে তাকে বহুগুচ্ছ (Polyadelphous) পুংস্তবক বলা হয়, যেমন— শিমুল। যখন পরাগধানী একগুচ্ছে থাকে তখন তাকে যুক্তধানী বা সিনজেনেসিয়াস (Syngenesious), যুক্ত অবস্থায় এবং পুংকেশর দলমণ্ডলের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে দলগত (Epipetalous) পুংস্তবক বলে যেমন— ধুতুরা।



চিত্র-১১.২ : বিভিন্ন ধরনের পুষ্পকেশর ক-একগুচ্ছ, খ-দ্বিগুচ্ছ, গ-বহুগুচ্ছ, ঘ- যুক্তধানী এবং ঙ- দলগল্লি।

স্ত্রীস্তবক (Gynoecium) : স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর এর অবস্থান ফুলটির কেন্দ্রে। এটি ফুলের আর একটি অত্যাাবশ্যকীয় স্তবক। স্ত্রীস্তবক এক বা একাধিক গর্ভপত্র (Carpel) নিয়ে গঠিত হতে পারে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা- গর্ভাশয় (Ovary), গর্ভদণ্ড (Style) ও গর্ভমুণ্ড (Stigma)। যখন কতগুলো গর্ভপত্র নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয় এবং এরা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তখন তাকে যুক্তগর্ভপত্রী (Syncarpous), আর আলাদা থাকলে বিযুক্তগর্ভপত্রী (Polycarpous) বলে।

গর্ভাশয়ের ভিতরে এক বা একাধিক ডিম্বক বিশেষ নিয়মে সজ্জিত থাকে। এসব ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রী প্রজননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এই ডিম্বাণুই পুষ্পস্তবকের ন্যায় সরাসরি জনন কাজে অংশ গ্রহণ করে।

কাজ-১ : ফুলের বিভিন্ন স্তবক পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : একটি ফুল, ব্রেড, চিমটা, ব্লটিং পেপার।

ফুল সংগ্রহ করে এর যে কোনো একটির বিভিন্ন অংশ আলাদা করে ব্লটিং পেপারে সাজিয়ে রাখ।

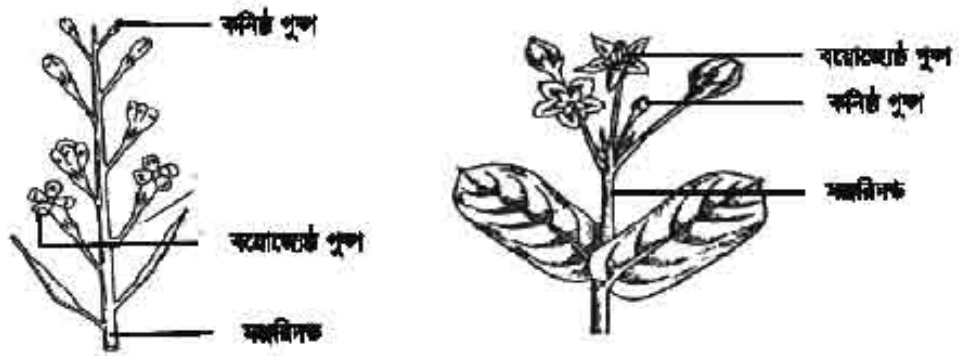
কাজ-২ : গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : একটি পরিণত ফুল, ব্রেড, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

ফুল থেকে গর্ভাশয় আলাদা করে ব্রেড দিয়ে প্রস্থে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা কর। যা যা দেখলে বাতায় লেখ।

পুষ্পমঞ্জরি

পুষ্পমঞ্জরি তোমরা সবাই দেখেছ। গাছের ছোট একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে। ফুলসহ এই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে। যে শাখায় ফুলগুলি সজ্জিত থাকে তাকে মঞ্জরিদণ্ড বলে। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি ও পুষ্প উৎপাদনের ফলে বৃদ্ধি থেমে গেলে তাকে নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি বলে। পরাগায়নের জন্য পুষ্পমঞ্জরির গুরুত্ব খুব বেশি।



চিত্র ১১.৩ : স্ব-অনিয়ত পুষ্পমজ্জরি, স্ব নিয়ত পুষ্পমজ্জরি

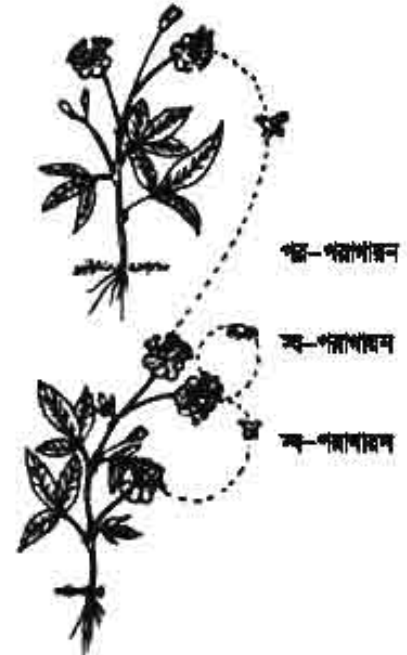
প্রজননের প্রধান দুটো ধাপ হচ্ছে স্বাভাবিক প্ৰাপ্যায়ন ও নিষেক। নিম্নে এদুটো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্ৰাপ্যায়ন

প্ৰাপ্যায়নকে প্ৰাপ্য সত্ত্বাপণও বলা হয়। প্ৰাপ্যায়ন কল ও বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বপর্ষ। ফুলের প্ৰাপ্যায়নী হতে প্ৰাপ্যায়ন পূর্ণ একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের পর্ষমুখে স্থানান্তরিত হওয়ারকে প্ৰাপ্যায়ন বলে। প্ৰাপ্যায়ন দুপ্রকার, যথা- ১. স্ব-প্ৰাপ্যায়ন ও ২. পর-প্ৰাপ্যায়ন।

১. স্ব-প্ৰাপ্যায়ন : একই ফুলে বা একই গাছের তিন দুটি ফুলের মধ্যে যখন প্ৰাপ্যায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব-প্ৰাপ্যায়ন বলে। সরিষা, কুমড়া, গুজুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব-প্ৰাপ্যায়ন ঘটে।

স্ব-প্ৰাপ্যায়নের কলে প্ৰাপ্যায়ন পূর্ণ অগতঃ কম হয়, প্ৰাপ্যায়নের জন্য বহুকের উপর নির্ভর করতে হয় না এক প্ৰাপ্যায়ন নিশ্চিত হয়। এর কলে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাতে বৈশিষ্ট্যেরও কোনো পরিবর্তন আসে না বলে প্রজাতির গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে। এভাবেই কোনো একটি প্রজাতির চরিত্রগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। তবে মনু প্রজন্মের উদ্ভিদে মনু পুনের অবিকার ঘটে না। মনু প্রজন্মের গাছ কম জীবনীশক্তিমান বীজের সৃষ্টি করে। মনু গাছের অতিবোধন কমতা কমে যায় এবং এক সময়ে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে।



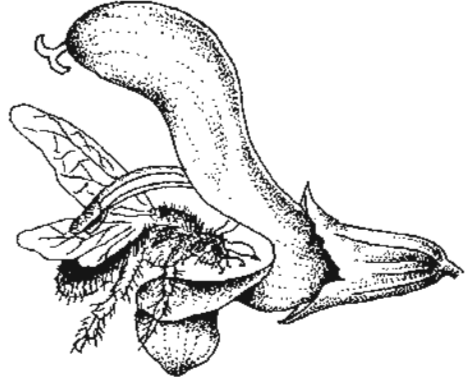
চিত্র ১১.৪ : স্ব-প্ৰাপ্যায়ন ও পর-প্ৰাপ্যায়ন

২. পরপ্ৰাপ্যায়ন : একই প্রজাতির দুটি তিন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন প্ৰাপ্যায়ন সত্ত্বাপণ ঘটে তখন তাকে পর-প্ৰাপ্যায়ন বলে। শিমূল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে পর-প্ৰাপ্যায়ন হতে দেখা যায়।

পর-প্ৰাপ্যায়নের কলে নতুন চরিত্রের সৃষ্টি হয়, বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বৃদ্ধি পায়, বীজ অধিক জীবনীশক্তি সম্পন্ন হয় ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। দুটি তিন গুণসম্পন্ন গাছের মধ্যে প্ৰাপ্যায়ন ঘটে তাই এর কলে যে বীজ উৎপন্ন হয় তা নতুন গুণসম্পন্ন হয়। এ বীজ থেকে যে গাছ জন্মায় তাও নতুন গুণসম্পন্ন হয়। একারণে এসব গাছের নতুন ভিন্নতাই সৃষ্টি হয়। তবে এটি বহু নির্ভর প্রক্রিয়া হওয়ায় প্ৰাপ্যায়নের নিশ্চয়তা থাক না, এতে প্রচুর প্ৰাপ্যায়ন পূর্ণ অগতঃ ঘটে কলে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।

পরাগায়নের মাধ্যম

পরাগ স্থানান্তরের কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। যে পরাগ বহন করে গর্ভমুণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যায় তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে। বায়ু, পানি, কীট-পতঙ্গ, পাখি, বাদুড়, শামুক এমনকি মানুষ এ ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মধু খেতে অথবা সুন্দর রঙের আকর্ষণে পতঙ্গ বা প্রাণী ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। সে সময়ে ঐ ফুলের পরাগরেণু বাহকের গায়ে লেগে যায়। এই বাহকটি যখন অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগ পরবর্তী ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেগে যায়। এভাবে পরাগায়ন ঘটে। পরাগায়নের মাধ্যমগুলোর সাহায্য পেতে ফুলের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।



চিত্র-১১.৫: পতঙ্গপরাগী ফুল।

পতঙ্গ পরাগী ফুল বড়, রঞ্জীন ও মধুগ্রন্থিযুক্ত এবং পরাগরেণু ও গর্ভমুণ্ড আঁঠালো সুগন্ধযুক্ত হয়, যেমন- জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।

বায়ুপরাগী ফুল, হালকা ও মধুগ্রন্থিহীন। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। এরা সহজেই বাতাসে ভেসে যেতে পারে। এদের গর্ভমুণ্ড আঁঠালো ও শাখান্বিত, কখনও পালকের মতো ফলে বাতাস থেকে পরাগরেণু সহজেই সঞ্চার করে নিতে পারে, যেমন-ধান।



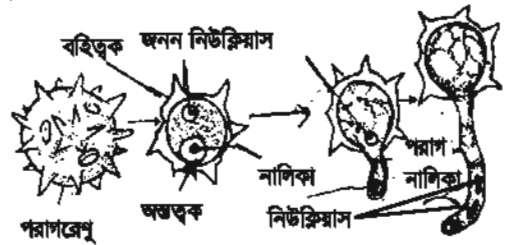
চিত্র-১১.৬: প্রাণিপরাগী ফুল।

পানিপরাগী ফুল আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা। এরা সহজেই পানিতে ভাসতে পারে। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। স্ত্রীপুষ্পে বৃন্ত লম্বা কিন্তু পুংফুলের বৃন্ত ছোট। পরিণত পুংপুষ্প বৃন্ত থেকে খুলে পানিতে ভাসতে থাকে এবং স্ত্রী পুষ্পের কাছে পৌঁছালে সেখানেই পরাগায়ন ঘটে, যেমন- পাতাশ্যাওলা।

প্রাণীপরাগী এসব ফুল মোটামুটি বড় ধরনের হয় তবে ছোট হলে ফুলগুলো পুষ্পমঞ্জরিতে সজ্জিত থাকে। এদের রং আকর্ষণীয় হয়। এসব ফুলে গন্ধ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে যেমন- কদম, শিমুল, কচু ইত্যাদি।

পুং-গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি (Microsporogenesis)

পরাগরেণু পুং-গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরপর পরাগরেণু পরাগথলিতে থাকা অবস্থায়ই অঙ্গরোদগম শুরু হয়। পরাগরেণুর কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। এ বিভাজনে একটি বড় কোষ ও একটি ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়। বড়কোষটিকে নালিকোষ (Tube cell) এবং ক্ষুদ্র কোষটিকে জেনারেটিভ কোষ (Generative Cell) বলে।

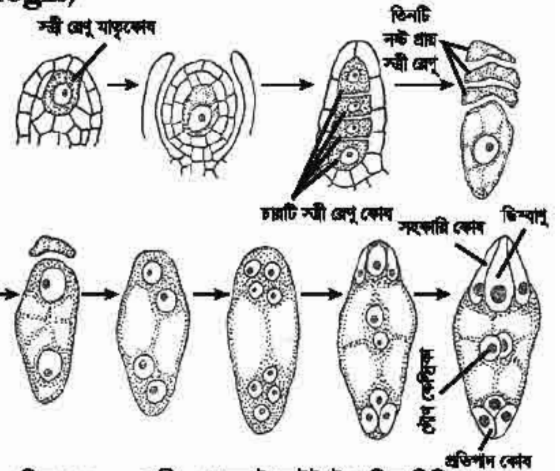


চিত্র-১১.৭ : পুং-গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

নালিকোষ বৃদ্ধিপাশ্চ হয়ে পরাগনালি (Pollen tube) এবং জেনারেটিভ কোষটি বিভাজিত হয়ে দুটি পুংজনন কোষ (Male gametes) উৎপন্ন হয়। জেনারেটিভ কোষের এ বিভাজন পরাগরেণুতে অথবা পরাগনালিতে সংঘটিত হতে পারে।

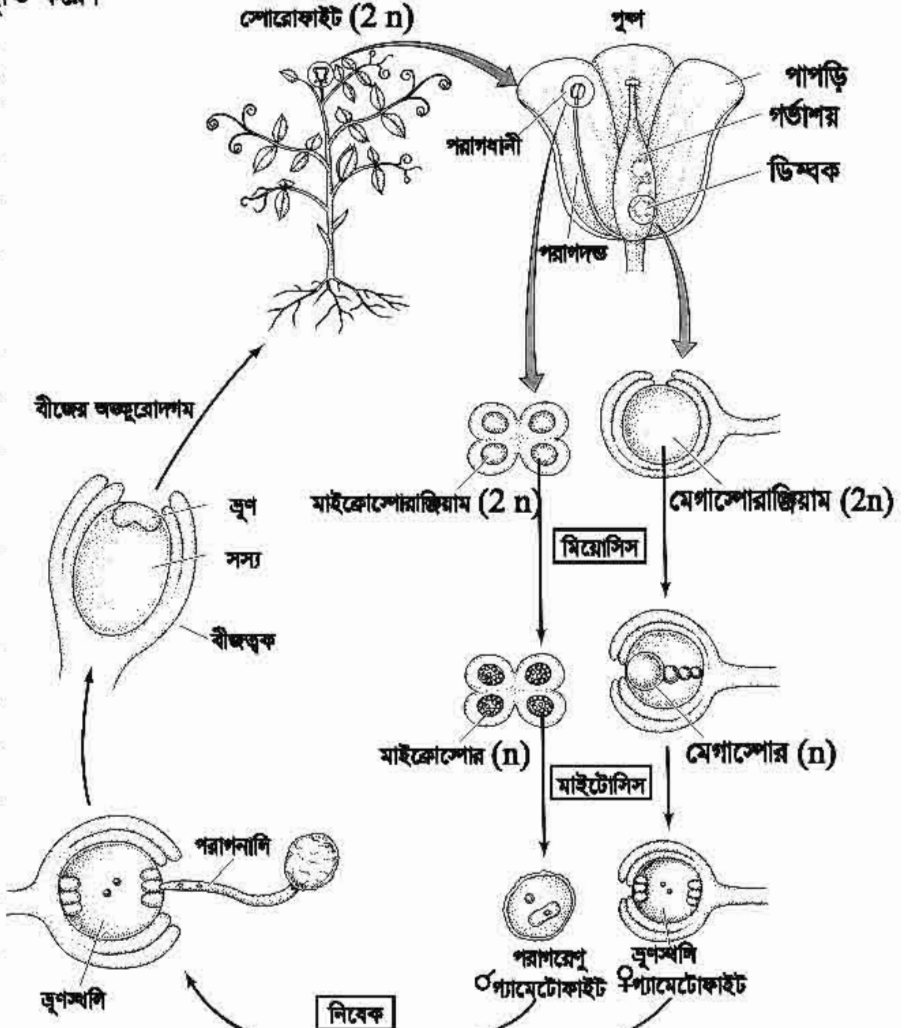
সত্রী-গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি (Megasporogenesis)

ভ্রূণগোষক কলায় (Nucellus tissue) ডিম্বক রন্ধ্রের কাছাকাছি একটি কোষ আকারে সামান্য বড় হয়। এর প্রোটোপ্লাজম ঘন এবং কেন্দ্রিকাটি ভুলনামূলকভাবে বড়। এ কোষটি বিয়োজন বিভাজন (Meiosis) এর মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ সৃষ্টি করে। সর্বনিম্ন কোষটি ছাড়া বাকি তিনটি কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়। সর্বনিম্ন এই বড় কোষটি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ ভ্রূণথলিতে পরিণত হয়। এ কোষটির কেন্দ্রিকা হ্যাপ্লয়েড (n)। এই কেন্দ্রিকাটি বিভক্ত হয়ে দুটি কেন্দ্রিকায় পরিণত হয়। এ কেন্দ্রিকাদ্বয় ভ্রূণথলির দুই মেরুতে অবস্থান নেয়। এবার এ দুটি কেন্দ্রিকার প্রতিটি পরপর দুবার বিভক্ত হয়ে চারটি করে কেন্দ্রিকার সৃষ্টি করে।



চিত্র-১১.৮ : সত্রী-গ্যামেটোফাইট উৎপত্তির বিভিন্ন ধাপ

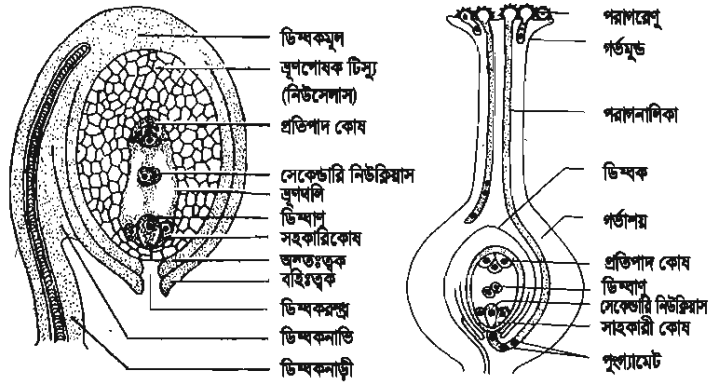
এর পরবর্তী ধাপে দুইমেরু থেকে একটি করে কেন্দ্রিকা ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) গৌণ কেন্দ্রিকা (Secondary nucleus) সৃষ্টি করে। দুই মেরুর কেন্দ্রিকাগুলো সামান্য সাইটোপ্লাজম সহকারে কোষের সৃষ্টি করে। ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের কোষ তিনটিকে গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus) বলে। এর মাঝের কোষটি বড়। একে ডিম্বাণু (Egg) ও অন্য কোষকে সহকারি কোষ (Synergids) বলা হয়। গর্ভযন্ত্রের বিপরীত দিকের কোষ তিনটিকে প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cells) বলে। এভাবেই ভ্রূণথলির গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়।



চিত্র ১১.৯ : সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্র

নিষেক (Fertilization)

পরাগায়নের ফলে পরিণত পরাগরেণু গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে (Style) পতিত হয়। এরপর পরাগনালিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গর্ভদন্ত ভেদ করে। এবং কিছু তরল পদার্থ শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠে। এক সময় এ স্ফীত অগ্রভাগটি ফেটে পুংজনন কোষ দুইটি ভূণথলিতে মুক্ত হয়। এর একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি করে। অপর পুংজনন কোষটি গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য কোষ (Endosperm cells) এর সৃষ্টি করে।



চিত্র-১১.১১: ডিম্বাণুর গঠন ও নিষেক প্রক্রিয়া।

প্রায় একই সময়ে দুটি পুংজনন কোষের একটি ডিম্বাণু ও অপরটি গৌণ কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়। এ ঘটনাকে দ্বিনিষেক (Double fertilization) বলা হয়।

নতুন স্পোরোফাইট গঠন (Development of new sporophyte)

জাইগোট কোষটি স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। এর প্রথম বিভাজনে দুটি কোষ সৃষ্টি হয়। একই সাথে সস্যের পরিস্ফুটনও ঘটতে শুরু করে। জাইগোটের বিভাজন অনুপ্রস্থে (Transversely) ঘটে। ডিম্বকরস্তুকের দিকের কোষকে ভিত্তি কোষ (Basal cell) এবং ভূণথলির কেন্দ্রের দিকের কোষটিকে এপিক্যাল কোষ (Apical cell) বলা হয়। একই সাথে এ কোষ দুটির বিভাজন চলতে থাকে। ধীরে ধীরে এপিক্যাল কোষটি একটি ভূণে পরিণত হয়। একই সাথে ভিত্তি কোষ থেকে ভূণধারক (Suspensor) গঠন করে। ক্রমশ বীজপত্র, ভূণমূল ও ভূণকান্ডের সৃষ্টি হয়। ক্রমান্বয়ে গৌণকেন্দ্রিকটি সস্যটিসু উৎপন্ন করে। এই সস্য কোষগুলো ট্রিপ্লয়েড অর্থাৎ এর কেন্দ্রিকায় 3n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। পরিণত অবস্থায় ডিম্বকটি সস্য ও ভূণসহ বীজে পরিণত হয়। এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইটের সৃষ্টি করে।

অতএব দেখা গেল একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রে স্পোরোফাইট ও গ্যামেটোফাইট নামক দুইটি স্তর একটির পর একটি চক্রাকারে চলতে থাকে।

ফলের উৎপত্তি : আমরা ফল বলতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঁড়ুর, আপেল, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। লাউ, কুমড়া, খিঁড়া, পটল এরাও ফল। এদের কাঁচা খাওয়া হয় না বলে এদের সবজি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা সবাই ফল। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্ভীপনার সৃষ্টি করে তার কারণে ধীরে ধীরে এটি ফলে পরিণত হয় এবং এর ডিম্বকগুলো বীজে রূপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে।

শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন- আম, কাঁঠাল। গর্ভাশয়সহ ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন- আপেল, চালতা ইত্যাদি। সব প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সরল ফল, গুচ্ছফল ও যৌগিক ফল।

প্রাণীর প্রজনন : প্রাণীজগতে দুই ধরনের প্রজনন দেখা যায়। যথা- ১. অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) ও ২. যৌন প্রজনন (Sexual reproduction)।

১. অযৌন প্রজনন : নিম্ন শ্রেণির প্রাণীতে অযৌন প্রজনন ঘটে। মুকুলোদগম (Budding), বিভাজন, খন্ডায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অযৌন জনন হয়।
২. যৌন প্রজনন : যে প্রক্রিয়ায় দুইটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণী পুং ও স্ত্রী জনন কোষ বা গ্যামেট (Gamete) উৎপন্ন করে এবং তাদের নিষেকের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায় ও সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে তাকে যৌন প্রজনন বলে।

নিষেক (Fertilization) : যৌন প্রজননের জন্য নিষেক প্রয়োজন। এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যৌন প্রজননে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। শুক্রাণু সক্রিয়ভাবে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে এবং এদের নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর একীভূত হয়। একীভূত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয় তাকে নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য কিছু সময় লাগে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) অর্থাৎ এক প্রস্থ ক্রোমোজোম (Chromosome) বহন করে। জাইগোট ডিপ্লয়েড (2n) বা দুইপ্রস্থ ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুং উভয় জননকোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি নিষেকের পূর্বশর্ত।

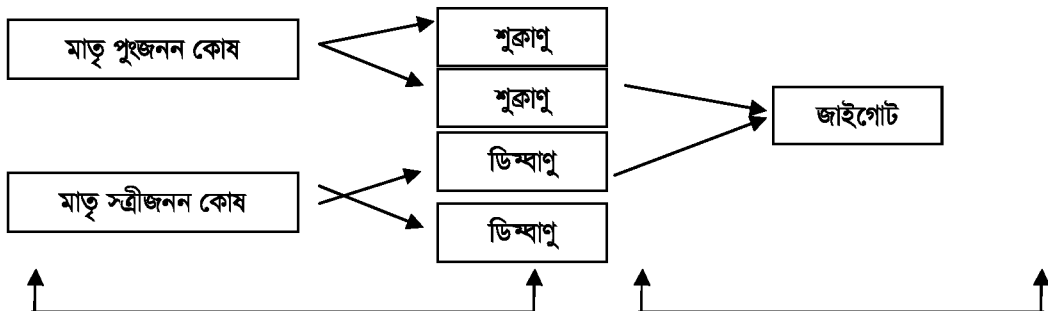
নিষেক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। কেবল একই প্রজাতির পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে এটি সংঘটিত হয়। নিষেক সাধারণত অপরিবর্তনশীল। একবার নিষিক্ত হলে ঐ ডিমটিকে পুনরায় নিষিক্ত করা যায় না। নিষেক দুই ধরনের—

১. বহিঃনিষেক (External Fertilization) এবং ২. অন্তঃনিষেক (Internal Fertilization)।

১. বহিঃনিষেক : যে নিষেক ক্রিয়া প্রাণীদেহের বাইরে সংঘটিত হয় তা বহিঃনিষেক নামে পরিচিত। এ ধরনের নিষেক সাধারণত পানিতে বাস করে এমন সব প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন— বিভিন্ন ধরনের মাছ। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন— হাঙ্গার এবং কয়েক প্রজাতির মাছ।
২. অন্তঃনিষেক : স্ত্রী দেহের জননাঙ্গে সংঘটিত নিষেক অন্তঃনিষেক নামে পরিচিত। সাধারণত সজ্জামের মাধ্যমে পুরুষ প্রাণী তার শুক্রাণু স্ত্রী জননাঙ্গে প্রবেশ করিয়ে এ ধরনের নিষেক ঘটায়। অন্তঃনিষেক ডাঙায় বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নিষেকের কয়েকটি মৌলিক তাৎপর্য— নিষেক ভ্রূণে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে পুনঃস্থাপিত করে, ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে, ক্রোমোজোম কর্তৃক বহনকৃত পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্রিত করে ও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

নিচের ব্লক চিত্রের সাহায্যে মানুষের প্রজননের ধাপগুলো দেখানো হলো:



চিত্র ১১.১২ : মানব প্রজননের বিভিন্ন ধাপ (ব্লক চিত্র)

বংশবিস্তার এবং তার সংরক্ষণের জন্য প্রজনন প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় ও সন্তান জন্ম নেয়। মানুষ একলিঙ্গা বিশিষ্ট প্রাণী অর্থাৎ প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষে পৃথক পৃথক অঙ্গ বর্তমান।

মানব প্রজননে হরমোনের ভূমিকা

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছ যে হরমোন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। যা নালিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি রাসায়নিক দূত হিসেবে রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় এবং শারীরবৃত্তিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। হরমোন নির্দিষ্ট অথচ স্বল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়ে নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি বা কম নিঃসরণ হলে দেহের বিভিন্ন কাজের ব্যাঘাত ঘটে। দেহে নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

আমাদের দেহে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলো প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণ করে।

১. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland) ২. থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) ৩. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland) ৪. শূক্রাশয়ের অনাগ্রন্থি (Testis) ৫. ডিম্বাশয়ের অনাগ্রন্থি (Ovary) ৬. অমরা (Placenta)।

পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে বৃন্দী উদ্দীপক হরমোন ও উৎপাদক হরমোন নিঃসৃত হয়। এ হরমোনগুলো জননগ্রন্থি বৃন্দী, ক্ষরণ ও কাজ নিয়ন্ত্রণ, মাতৃদেহে স্তন ও দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এগুলো জরায়ুর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নিঃসৃত হয়। এ হরমোন দৈহিক ও মানসিক বৃন্দী, যৌন লক্ষণ প্রকাশ ও বিপাকে সহায়তা করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন যৌনাজ্ঞা বৃন্দী ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। শূক্রাশয় থেকে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন ও অ্যাড্রোজেন শূক্রাণু উৎপাদন, দাঁড়ি গোফ গজানো, গলার স্বর বদলানো ইত্যাদি যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন হরমোন মেয়েদের নারী সুলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি, ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ, গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃন্দী নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া ডিম্বাণু উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অমরা থেকে নিঃসৃত গোনাদোট্রপিক ও প্রোজেস্টেরন ডিম্বাশয়ের অনাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করে ও স্তনগ্রন্থির বৃন্দী নিয়ন্ত্রণ করে।

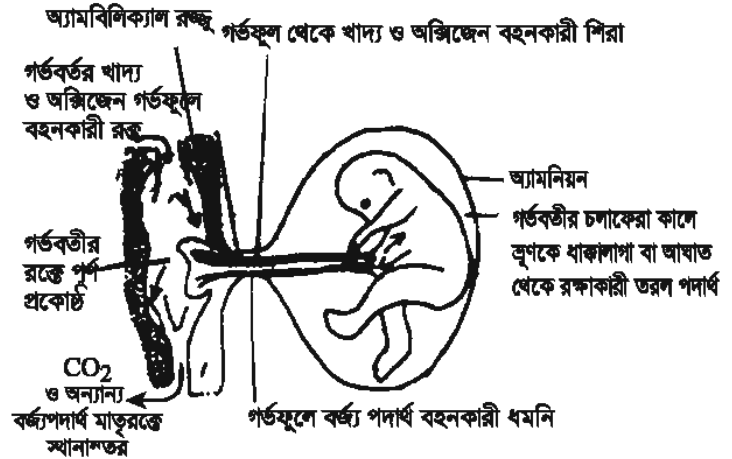
মানব শিশু জন্মগ্রহণের সময় তাদের প্রজননতন্ত্র অপরিণত অবস্থায় থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের দৈহিক বৃন্দী ঘটে, দৈহিক বৃন্দীর সময় তাদের প্রজনন তন্ত্রের অঙ্গসমূহের বৃন্দী ও বিকাশ ঘটতে থাকে। হরমোন এ সব কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশু তার বাল্যকাল অতিক্রম করে কৈশোর ও তারুণ্যে উপনীত হয়। কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিকালই হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে। তাদের দেহের বাইরে ও ভিতরে পরিবর্তন ঘটে, যেমন— ছেলেদের গৌণ দাড়ি গজায়, গলার স্বর পরিবর্তন হয় ও কাঁধ চওড়া হয় ইত্যাদি।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের দেহে যেসব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা হলো— নারীসুলভ লজ্জা ও সংকোচ প্রকাশ, দেহত্বক কোমল হয়, ঋতুস্রাব বা মাসিক হয় ও চেহারা কমণীয়তা বৃন্দী পায় ইত্যাদি। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্তস্রাব হয়। একে মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। বয়ঃসন্ধিকালের ১-২ বছর পর মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণত ৪০-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের ঋতুস্রাব চক্র চলতে থাকে। এরপর ঋতুস্রাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। একে মেনোপজ (Menopause) বা রজনিবৃত্তিকাল বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার গর্ভাবস্থায় মেয়েদের রক্তস্রাব সাময়িক বন্ধ থাকে। সন্তান প্রসবের প্রায় দেড় মাস পর স্বাভাবিক রক্তস্রাব আবার শুরু হয়।

বিবাহ একটি সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক বন্ধন। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি পরিবার গড়ে উঠে। তারা দুজনে নির্দিষ্টায় মেলামেশা করতে পারে। তাদের মাঝে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিবাহের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমা থাকা দরকার। মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বাল্য বিবাহের ফলে মেয়েরা অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করে। এতে গর্ভবতী মা ও সন্তান উভয়েরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যৌন মিলন ঘটে। যৌন মিলনের সময় পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী প্রজনন অঙ্গে প্রবেশ করে। শুক্রাণুতে লেজ থাকে। যা তাকে সাঁতারিয়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করতে সহায়তা করে। পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে স্ত্রীর ডিম্বনালিতে। এই মিলনকে নিষেক বলে। তবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি শুক্রাণু দ্বারা একটি মাত্র ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। এভাবে মানব দেহের ভিতরে অন্তঃনিষেক ঘটে। এ বিশেষ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোম (n) ও ডিম্বাণুর একপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (n) মিলন ঘটে ফলে দুইপ্রস্থ ক্রোমোজোমের (2n) সমন্বয়ে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়।

ভ্রূণের বিকাশ : নিষিক্ত ডিম্বাণু ধীরে ধীরে ডিম্বনালি বেয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন বা ক্লিভেজ চলতে থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ের গঠনযুক্ত ভ্রূণ ডিম্বনালি থেকে জরায়ুতে পৌঁছায়। এ পর্যায়ে ভ্রূণকে ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) বলা হয়। জরায়ুতে এর পরে যে ঘটনাবলীর অবতারণা হয় তা ভ্রূণ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র ১১.১৩ : মাতৃগর্ভে আমরা ও ভ্রূণ

ব্লাস্টোসিস্ট পরবর্তী পর্যায়গুলো সমাপনের জন্য

ভ্রূণকে জরায়ুর প্রাচীরে সংলগ্ন হতে হয়। জরায়ুর প্রাচীরে ভ্রূণের এ সংযুক্তিকে ভ্রূণ সংস্থাপন (Implantation) বা গর্ভধারণ বলে। জরায়ুর অন্তঃগায়ে সংলগ্ন অবস্থায় ভ্রূণটি বৃদ্ধি পায় ও মানব শিশুতে পরিণত হয়। জরায়ুর অন্তঃগায়ে ভ্রূণের সংস্থাপন হওয়ার পর থেকে শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়কে গর্ভাবস্থা বলে। এ সময় মাসিক বা রক্তচক্র বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ৩৮-৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভাবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অমরা (Placenta) : যে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু টিস্যুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে অমরা বা গর্ভফুল বলে। ভ্রূণ জরায়ুতে পৌঁছানোর ৪-৫ দিনের মধ্যে সংস্থাপন সম্পন্ন হয়। ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণের কিছু কোষ এবং মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের কিছু কোষ মিলিত হয়ে ডিম্বাকার ও রক্তনালি সমৃদ্ধ অমরা গঠন করে। এভাবে ভ্রূণ ও মাতৃ জরায়ুর অন্তঃস্তরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য অস্থায়ী অঙ্গ তৈরি করে। প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে নিষ্কৃত হয়।

অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ুর গায়ে সংস্থাপিত হয়। এতে ভ্রূণের কোনো ক্ষতি হয় না। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের দরকার। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, পানি ও খনিজ লবণ ইত্যাদি অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করে। অমরা অনেকটা ফুসফুসের মতো কাজ করে। অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং ভ্রূণ থেকে

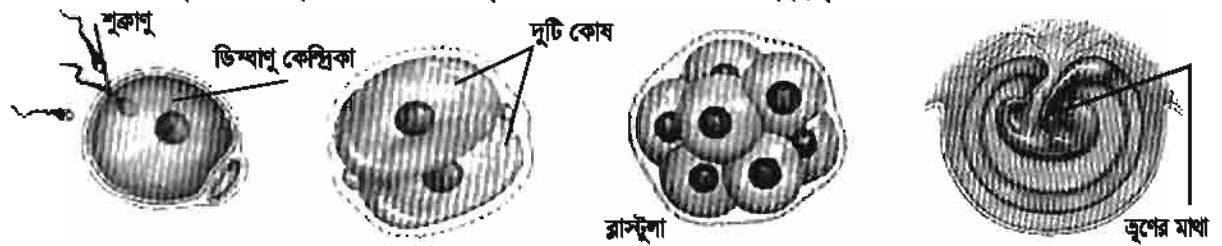
কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে। আমরা বৃকের মতো কাজ করে। বিপাকের ফলে যে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তা আমাদের মাধ্যমে ভ্রূণের দেহ থেকে অপসারিত হয়। আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করে। এ হরমোন ভ্রূণের রক্তগোবেক্ষণ ও স্বাভাবিক গঠনে সাহায্য করে।

নিষেকের ১২ সপ্তাহের মধ্যে আমরা গঠিত হয়। গর্ভাবস্থায় আমরা মাধ্যমে ভ্রূণ ও মায়ের দেহ প্রয়োজনীয় পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ আদান-প্রদান করে।

অমরাতে প্রচুর রক্তনালি থাকে। আমরা অ্যাম্বলিকাল কর্ড ভ্রূণের নাভির সাথে যুক্ত থাকে। একে নাড়ীও বলা হয়। এটা মূলত একটি নালি যার ভেতর দিয়ে মাতৃদেহের সাথে ভ্রূণের বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটে। গর্ভাবস্থায় আমরা থেকে এমন কতকগুলো হরমোন নিঃসৃত হয় যা মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন ও প্রসব সহজ করতে সহায়তা করে।

ভ্রূণ আবরণী

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের জন্য মাতৃদেহের ভিতর সহজ, স্বাভাবিক ও নিরাপদ পরিবর্তনের ব্যবস্থা হিসেবে ভ্রূণের চারদিকে কতকগুলো ঝিল্লী বা আবরণ থাকে। এগুলো ভ্রূণের পুষ্টি, গ্যাসীয় আদান-প্রদান, বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে। ভ্রূণ আবরণীগুলো ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণকে রক্ষা করে এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণে অংশ নেয়।



১. শূক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ

২. প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম্বাণুর কোষ বিভাজন

৩. প্রায় ৭২ ঘণ্টার পর ১৬ কোষবিশিষ্ট একটি গঠন পরবর্তীতে এটা বলের মতো আকার ধারণ করে।

৪. চার সপ্তাহ পরে ভ্রূণখলি তরলের মধ্যে ভাসতে থাকে। এসময় হৃদস্পন্দন ও মস্তিষ্কের গঠন শুরু হয়।



৫. প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে ভ্রূণের বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং হাত ও পায়ের গঠনের মুকুলের মতো অঙ্গানু সৃষ্টি হয়।

৬. প্রায় ৮ সপ্তাহ পরে ভ্রূণকে ফিটাস বলা হয়। কিন্তু অঙ্গগুলো ছোট আকারে থাকে।

৭. ২৮ সপ্তাহ পরে ফিটাস পূর্ণাঙ্গতাপ্রাপ্ত হয়। ভ্রূণের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

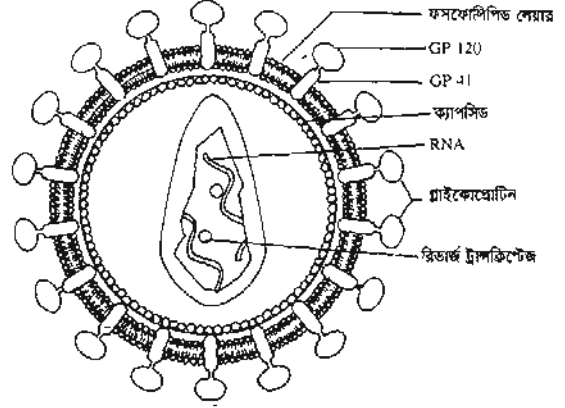
৮. ৩৮ সপ্তাহে জরায়ু ভিতর ফিটাসের মাথা নিচের দিকে ঘুরে যায় এবং ভ্রূমিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে।

ভ্রূণ মাতৃগর্ভে গড়ে প্রায় ৪০ সপ্তাহ অবস্থান করে। ঐ একই সময়ে গর্ভবতী মায়ের অগ্নি গিটুইটারি ও অমরা থেকে হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। ৪০ তম সপ্তাহে হরমোনদ্বয় সক্রিয় হয়। প্রসবের পূর্বে জন্ম নিরীকৃত ব্যবধানে সংকুচিত হতে থাকে ও ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি হয়। এই ক্রমবর্ধমান বেদনাকে প্রসব বেদনা বলে। প্রসবের শেষপর্যায়ে ভ্রূণের বাইরের পর্দাগুলো ফেটে যায়। এর ভিতরের তরল বাইরে নির্গত হয়। এক পর্যায়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রজনন সংক্রান্ত রোগ

এইডস (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)) : বর্তমান বিশ্বে এইডস একটি মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি হিসেবে পরিচিত। ১৯৮১ সনে রোগটি

আবিষ্কৃত হয়। Acquired Immune Deficiency Syndrome এর প্রত্যেকটি শব্দের অদ্যাক্ষর দিয়ে এ রোগটির নামকরণ করা হয়েছে। UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি লোক AIDS এর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ হলো নারী। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৬৪টি দেশে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। Human Immune Deficiency Virus সংক্ষেপে HIV ভাইরাস-এর আক্রমণে এইডস হয়। এই ভাইরাস শ্বেত রক্তকণিকার ক্ষতি সাধন করে ও এ কণিকার এন্টিবডি তৈরিতে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা ও এন্টিবডির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে সুস্থ অবস্থায় অনেকদিন থাকতে পারে। এই ভাইরাসের আক্রমণে রোগীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় ফলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ এইডস রোগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার মতো কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি।



চিত্র ১১.১৫ : HIV এর গঠন

এইডস রোগের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে একজন সুস্থ ব্যক্তি এই ঘাতক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন—

১. এইডস আক্রান্ত পুরুষ ও মহিলার যৌন মিলনের মাধ্যমে এ রোগ হয়। দুর্ঘটনাজনিত রক্তক্ষরণ, প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ, বড় অস্ত্রোপচার, রক্তশূন্যতা, ধালাসোমিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্ত সুস্থ ব্যক্তির দেহে সঞ্চালন করলে এইডস রোগ হয়।
২. এইডস এ আক্রান্ত বাবা মায়ের সন্তান এইডস রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত মায়ের দুধ শিশু পান করলে সে শিশুও এইডস এ আক্রান্ত হতে পারে।
৩. HIV জীবাণুযুক্ত ইনজেকশানের সিরিঞ্জ, সূচ, দন্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমেও সুস্থ ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
৪. আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপনকালে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

এইডস রোগের লক্ষণ

রোগ জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবেশ করার প্রায় ৬ মাস পরে এই রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। এর আগে উক্ত ব্যক্তি যে এইডস রোগের বাহক তা বোঝা যায় না। লক্ষণগুলো হলো—

- অতি দ্রুত রোগীর ওজন কমতে থাকে।
- এক মাসেরও বেশি সময়ব্যাপী একটানা জ্বর থাকে অথবা জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয়।
- একমাস বা তারও বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেকদিন ধরে শুকনো কাশি হতে থাকে।
- ঘাড় ও বগলে ব্যথা অনুভব করা, মুখ-মণ্ডল খসখসে হয়ে যায়।
- মুখমণ্ডল, চোখের পাতা, নাক ইত্যাদি অঙ্গ হঠাৎ ফুলে যায় ও সহজে ফোলা কমে না।
- সারা দেহে চুলকানি হয়।

এইডস রোগ প্রতিরোধের উপায়

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে এই রোগ সম্পর্কে জেনেছ। এস আমরা সেগুলো মনে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেই।

- এইডস প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?
- এই রোগ বিস্তারের কারণগুলো থেকে বিরত থেকে রোগটি প্রতিরোধ করা কি সম্ভব? তোমরা প্রতিরোধের উপায়গুলো বোর্ডে লেখ ও একটি সর্থক্ষিপ্তসার তৈরি কর।

কাজ: তোমরা ৫ জন করে এক একটি দলে ভাগ হয়ে এইডস প্রতিরোধের বিষয়ে পোস্টার/লিফলেট অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

খ. সর্থক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষকে এক লিঙ্গাবিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় কেন?
২. জরায়ু কী? এর প্রয়োজনীয়তা কী?
৩. অমরা কী? অমরার কাজ কী?
৪. এইডস রোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?
৫. কীভাবে সন্তান সম্ভবা মায়ের যত্ন নিতে হবে? ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফুলকে উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ বলা হয় কেন বর্ণনা কর।
২. এইডস রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ফুলে দ্বিগুচ্ছ পরাগদণ্ড থাকে?

ক. জবা

খ. মটর

গ. শিমুল

ঘ. সূর্যমুখী

২. বায়ুপরাগী ফুল—

i. আকারে বড় হয়

ii. গর্ভমুণ্ড শাখাবিহীন হয়

iii. মধুগ্রন্থি অনুপস্থিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

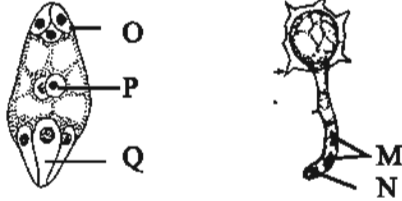
ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উদ্ভীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. উদ্ভীপকের কোনটি পরিবর্তিত হয়ে বীজ হয়?

ক. N

খ. O

গ. P

ঘ. Q

৪. সস্যকলা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে কোনটি?

ক. M ও Q

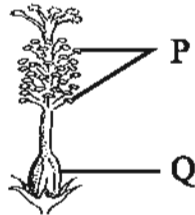
খ. M ও P

গ. M ও N

ঘ. N ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.



ক. পরাগথলি কী?

খ. অনিয়ত পুষ্পমঞ্জুরি বলতে কী বুঝায়?

গ. P অংশটি এই ফুলে অনুপস্থিত থাকলে পরাগায়নের ক্ষেত্রে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Q চিহ্নিত অংশটি কীভাবে প্রজাতিকে রক্ষা করে যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

২. ১২ বছরের হৃদয় ছোটবেলা থেকে সুরেলা কণ্ঠে গান গায়। ইদানিং কিছু দেহিক ও মানসিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তার গলার স্বর মোটা হয়ে গেছে। তাই তার মা চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি বললেন এ সময়ে শিশুদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক।

ক. আমরা কী?

খ. AIDS কে ঘাতক রোগ বলা হয় কেন?

গ. হৃদয়ের এ সময়ের ঘটনাগুলো ঘটর কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হৃদয়ের এ সময়ে পরিবারের বড়দের তার প্রতি করণীয় ভূমিকাগুলো ব্যাখ্যা কর।